এডেলেইডে সাতদিন

প্রদীপ দেব

০১

গ্রেহাউন্ড পাইওনীয়ার বাস টার্মিনালে পৌঁছে মনে হলো এতটা তাড়াহুড়ো না করলেও চলতো। আরো একঘন্টা পরে রাত সাড়ে দশটায় আমার বাস। যাচ্ছি এডেলেইড। মেলবোর্ন থেকে মাত্র আটশো কিলোমিটারের পথ।

বোর্ডিং পাস নিয়ে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া সময় কাটানোর আর কোন উপায় আপাতত নেই। টার্মিনালে বাস এখনো আসেনি। আসবে আরো আধঘন্টা পর। যাত্রীরা একজন দু'জন করে আসছে। ফিস ফিস করে কথা বলছে পরস্পর। একটা বাস টার্মিনালে যেরকম হৈ চৈ থাকাটা স্বাভাবিকের পর্যায়ে পড়ে এখানে শব্দমাত্রা তার চেয়ে কয়েকশ গুণ কম।

কোথাও যাবার পরিকল্পনা আমার যত আগে থেকেই থাকুক না কেন, যাবার পুর্ব মুহূর্তে তাড়াহুড়ো হবেই। যেমন আজকের সারাটি দিন গোছগাছ করতেই গেলো। সারাটি দিন বললে ভুল হবে। ঘুম থেকে উঠেছিই তো দিনের অর্ধেক সময় পার করে। গতরাতে কেনের বাড়িতে পার্টি ছিলো। কেন্ আমার রিসার্চ সুপারভাইজার। না যাবার কোন অজুহাত তাই ছিলো না। ফিরেছি রাত আড়াইটায়। ঘুম থেকে উঠতে মধ্যদুপুর তো হবেই। উঠেই মনে হয়েছে একটু কান্নাকাটি করি। কারণ আমার কিছুই গোছানো হয়নি। অথচ রাতেই মেলবোর্ন ছাড়তে হবে। ডিসেম্বর কি এবার তাড়াতাড়ি চলে এসেছে?

এডেলেইড যাবো স্থির হয়ে আছে প্রায় চার মাস আগে। আগস্টের এক সকাল বেলা ডিপার্টমেন্টে যেতেই আমার সুপারভাইজারের দরাজ গলা,
- প্রদীপ, ডিসেম্বরে তুমি এডেলেইড যাচ্ছো। এ-আই-পি কনফারেন্সে।
এ যেন মেঘ না চাইতে জল। অবশ্য ক'দিন পরে প্রস্তুতি নিতে গিয়ে বুঝতে পেরেছি এ জল নয়, প্লাবন। ডিসেম্বরে দূরে কোথাও যাবার প্ল্যান আমার এমনিতেই ছিলো। এডেলেইড বা ব্রিসবেন। মেলবোর্নের দক্ষিণে বা উত্তরে। তো অস্ট্রেলিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্সের দাক্ষিণ্যে দক্ষিণে যাওয়াটা যখন জুটে গেলো তখন তো খুশি হবারই কথা। নিউক্লিয়ার এন্ড পার্টিক্যাল ফিজিক্স সেশানে আমাদের একটা পেপার এক্সেপ্টেড হয়েছে। বেশ এক্সাইটেড হয়ে আছি আমি। একটা আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞান সম্মেলনে আমি নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে আমার নিজের গবেষণা লব্ধ ফলাফল নিয়ে বক্তৃতা দেবো ভাবতেই কেমন রোমাঞ্চ লাগছিলো।

সেপ্টেম্বরের শেষে কনফারেন্সের রেজিস্ট্রেশান সহ সমস্ত ফরমালিটি শেষ হলো। রেজিস্ট্রেশান ফি, থাকা খাওয়া, যাতায়াত ইত্যাদি সমস্ত খরচ বাবদ মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটি আমার রেগুলার স্কলারশিপের পাশাপাশি আরো একটা স্পেশাল পোস্ট গ্রাজুয়েট স্কলারশিপ দিয়েছে। যাতায়াতের জন্য প্লেন ভাড়া দিয়েছে কিন্তু আমি যাচ্ছি বাসে। বাসে যাবার সিদ্ধান্তটি আমার নিজস্ব। এরকম সিদ্ধান্ত নেবার কারণটা হাস্যকর। এস-টি-এ বা স্টুডেন্টস ট্রাভেল এজেন্সীতে গিয়ে জানতে চেয়েছিলাম এডেলেইডের প্লেনভাড়া কত পড়বে। তারা জানালো স্টুডেন্টস্ কন্সেশান বাদ দিয়ে মোট দুশ ছিয়াশি ডলার লাগবে মেলবোর্ন টু এডেলেইড রিটার্ন। দুশ ছিয়াশি ডলারকে খুব বেশি মনে হলো আমার কাছে। যদিও ভাড়া বাবদ আমি যত চাইবো ইউনিভার্সিটি আমাকে তাই দেবে। তবুও মনে হলো যাওয়া আসা সব মিলিয়ে মাত্র দু ঘন্টার ভ্রমণের জন্য প্রায় তিনশো ডলার খরচ করবো? অন্য একটা এয়ারলাইন্সে খবর নিতে গেলাম। অস্ট্রেলিয়ান ডোমেস্টিক এয়ারলাইন্স এন্জেট। এন্জেটের বিশাল উঁচু বিলডিংটা আমার অফিসের জানালা থেকে সরাসরি দেখা যায়। প্রতিদিন দেখতে দেখতে বিল্ডিংটার প্রতি প্রতিবেশী সুলভ একটা মনোভাবও জন্মে গেছে এতদিনে। একদিন সকালে গেলাম সে অফিসে।

কনফারেন্সের অফিসিয়াল এয়ারলাইন্স এই এন্জেট। কনফারেন্স ডেলিগেটদের জন্য শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ কনসেশানের কথা বলা আছে। মনে মনে এস-টি-এ কে বুড়ো আঙুলও দেখিয়ে ফেললাম। কিন্তু আমি তো জানতাম না যে এক ভীষণ গোলমেলে গাণিতিক হিসাব অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

ডেস্কে বসা শ্বেতাঙ্গী তরুণী তার কম্পিউটারের বোতাম অনেকক্ষণ ধরে টিপে টুপে, আমার কনফারেন্সের কাগজপত্র গভীর মনযোগ দিয়ে দেখে টেখে একগাল হেসে ঘোষণা করলো,
- ত্রি হানড্রেড এন্ড থার্টি থ্রি।
আমি বুঝতে পারছিলাম না 'তিনশো তেত্রিশ' - এটা কি আমাকে ফ্লাইট নাম্বার বলছে নাকি ভাড়ার পরিমাণ বলছে। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই সে বুঝে গেলো আমার অবস্থা। প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশিই বুঝে ফেললো। ভাবলো আমি ইংরেজি মোটেও বুঝতে পারছিনা। একটা কাগজে লিখে দিলো, 'মেলবোর্ন টু এডেলেইড রিটার্ন এয়ার ফেয়ার ত্রি হান্ড্রেড থার্টি থ্রি ডলার'। আমি বেশ বিনীত ভংগিতে বললাম,
- 'আমাদের তো পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট কন্সেশান দেয়ার কথা'।
তরুণীর ওষ্ঠে হাসির রেখা প্রকট হচ্ছে। ধীর লয়ে গান করার মতো করে আমাকে বোঝাতে শুরু করলো সে,
- শতকরা পঁয়তাল্লিশ পারসেন্ট বাদ দিয়েই ভাড়া আসে তিনশ তেত্রিশ ডলার।
- কিন্তু মাত্র দশ পারসেন্ট স্টুডেন্ট কন্সেশান বাদ দিয়ে এস-টি-এ কীভাবে দু'শ ছিয়াশি ডলারে দিচ্ছে? তাদেরও তো এন্জেট ফ্লাইট।
- ওহো, তুমি বুঝতে পারছো না। যেটা দু'শ ছিয়াশি ডলারে দিচ্ছে সেটা হলো জেনারেল ক্যাটাগরি। আর তিনশ তেত্রিশের টা হলো স্পেশাল ক্যাটাগরি। সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি এটাতে।
- এটা কি বিজনেস ক্লাস?

- না, ইকোনমি ক্লাস।
- তবে কি আলাদা ফ্লাইট?
- না, একই ফ্লাইট।
- তবে? একই ফ্লাইটে, একই ইকোনমি ক্লাসে কেউ যাবে তিনশ তেত্রিশ ডলার ভাড়া দিয়ে, কেউ যাবে দুশ ছিয়াশি ডলারে -
- ইয়েস। কেউ কেউ আবার ফ্রি টিকেটেও যাবে। তবে কথা হলো ৩৩৩ ডলারের টিকেটে তুমি যে কোন সময় টিকেট ক্যান্সেল বা ফ্লাইট চেঞ্জ করতে পারবে। তার জন্য তোমার কোন এক্সট্রা খরচ হবে না। কিন্তু ২৮৬ ডলারের টিকেটে তুমি সে সুযোগ পাবেনা। ক্যান্সেল করতে হলে বা ফ্লাইট চেঞ্জ করতে হলে তোমাকে কমপক্ষে বিশ দিন আগে জানাতে হবে। নইলে কোন টাকা ফেরত পাবে না। এখন ধরো, কোন কারণে তুমি যেতে পারছো না - ঠিক দুদিন আগে বা এক সপ্তাহ আগে জানতে পারলে তখন তুমি কী করবে? এমন তো হতেই পারে। ধরো তোমার কনফারেন্স পিছিয়ে গেলো বা ধরো তোমার গার্লফ্রেন্ডের অসুখ করলো বা ধরো তুমি বেটার কোন কনফারেনসের অফার পেলে - এরকম তো হতেই পারে, হরদম হচ্ছে- তাই ৩৩৩ ডলারের টিকেট ২৮৬ ডলারের টিকেটের চেয়ে সস্তা আর আরামদায়ক।

মেয়েটার কথা বলার ভঙ্গিটি চমৎকার। কথা বলার আর্টের জন্যই হয়তো এখানে চাকরিটা পেয়েছে সে। আমি মনযোগ দিয়ে তার কথা শুনলাম। কিন্তু এডেলেইডে বিমানে যাবার ইচ্ছাটা আর রইলো না। গণিতের প্রাথমিক ধারণা যতটুকু আমার আছে তা দিয়ে আমি এখনো বুঝতে পারছি না ৩৩৩ ডলার কীভাবে ২৮৬ ডলারের চেয়ে সস্তা হয়। হাসি মুখে তাকে ‘পরে জানাবো’ বলে উঠে চলে আসার সময় সে বললো,
- তোমার কন্‌ফারেন্স সফল হোক। গুড লাক।

ভাগ্যবাদীদের সুবিধা অনেক। সাফল্যকে নিজের কৃতিত্ব বলে চালিয়ে দিলেও ব্যর্থতাকে সহজেই ভাগ্যের কাঁধে চালান করে দেয়া যায়। আমার সে সুযোগ নেই। তারপরও আমি দিব্যি গ্রেহাউন্ড পাইওনীয়ার বাসের টার্মিনালে বসে আছি। আমার কনফারেনস্‌ও পিছায়নি এবং এসময়ে অসুস্থ হয়ে পড়ার মতো কোন গার্লফ্রেন্ডও আমার নেই।
বাস ছাড়লো পাঁচমিনিট দেরীতে। সাড়ে দশটাতেই ছাড়তো, কিন্তু একজন যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করাতেই এই দেরী। ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিয়েই তার দায়িত্ব মতো প্রথম ভাষণটি শুরু করলেন। প্রথমেই ক্ষমা চাইলেন পাঁচমিনিট দেরীর জন্য। অথচ যার জন্য দেরী হয়েছে সে আমার পাশের সিটে বসে হাঁপাচ্ছে এখনো। আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ভেবেছিলাম ড্রাইভারদের এই উদ্বোধনী ভাষণ কোন সময়েই বোধগম্য হবে না আমার। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম এই ড্রাইভারের প্রত্যেকটা শব্দই আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি। তবে কি এই ড্রাইভার কখনো এ-বি-সি রেডিওর নিউজ রীডার ছিলো? নাকি এই এক বছরের মধ্যে আমার শোনার কান তৈরি হয়েছে? সে যাই হোক। ড্রাইভার বাসের টয়লেট ব্যবহারের খুঁটিনাটি নিয়ম বিশদ ভাবে বলতে শুরু করেছেন। এতসব শোনার কোন দরকার নেই। আপাতত একটা টানা ঘুম দরকার। সেজন্যই বোর্ডিং পাস নেবার সময় জানালার পাশের সিট চেয়ে নিয়েছি।

ভ্রমণকালে সহযাত্রীকে ‘‘কোথায় যাবেন?’’ প্রশ্ন করার বদলে ‘‘অনেক দূর যাবেন কি?’’ প্রশ্ন

করা যেতে পারে। সৈয়দ মুজতবা আলীর এই সূত্র প্রয়োগ করার কোন দরকার এখানে নেই। কারণ আটচল্লিশ জন যাত্রীর সবাই এডেলেইড যাত্রী। আমার পাশের সিটে বসে এখনো হাঁপাচ্ছে চায়নিজ তরুণী। বাস ছাড়ার সময়েই সে ছুটতে ছুটতে এসে বাসে উঠেছে। চেহারা দেখে চায়নিজ তা বোঝা যায়। হংকং, চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ান বা অস্ট্রেলিয়া যে কোন দেশের হতে পারে সে। নাগরিকত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন এখানে অনেকেই করে থাকে। কিন্তু আমার কাছে প্রশ্নটা খুব একটা আকর্ষণীয় প্রশ্ন বলে মনে হয়না। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা ছাড়া বাকী সবাই তো অন্যদেশ থেকে এসেছে। মেয়েটার দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেলো। মৃদুস্বরে বললাম,

- হাই।

- হাই। ডু ইউ হ্যাভ এনি ওয়াটার উইথ ইউ?

- ইয়েপ্।

ইয়েসকে ইয়েপ্ বলাটা আমি শিখে ফেলেছি দেখছি।

বাসের পেছন দিকে খাবার পানির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বেচারী এমনই কাহিল হয়ে পড়েছে যে উঠে পানি খেতে যাবার মতো শক্তি মনে হয় তার আপাতত নেই। আমি আমার পানির বোতলটা তার দিকে এগিয়ে দিলাম। সে ঢক ঢক করে অনেকটা পানি খেয়ে নিলো। বাংলাদেশের ''চলার পথে অপরিচিত কারো কাছ থেকে কিছু খাবেন না'' জাতীয় কোন বাক্য এই মেয়েটি সম্ভবত কখনো শোনেনি। বাক্যটি তাকে বলতে ইচ্ছে করছিলো। কিন্তু চেপে গেলাম। বাক্যের অর্থটা ঠিকমতো বুঝতে না পারলে দেখা যাবে আমার কাছ থেকে পানি চাওয়ার জন্য অনুশোচনা করবে।

- থ্যাংক্স।

পানির বোতলটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো সে।

- ইউ আর ওয়েলকাম।

- আই ওয়াজ সো থার্স্টি! এনিওয়ে, আই এম জেনি।

জেনির সাথে পরিচয় হলো। ট্যাক্সিওয়ালা ভুল করে তাকে স্পেনসার স্ট্রিট স্টেশনে নিয়ে যায়। সে জন্যই তার এত দেরী হয়েছে। তারজন্যই বাস ছাড়তে দেরী হয়েছে সেই লজ্জায় সে এখনো লাল হয়ে আছে।

জেনির ইংরেজী উচ্চারণে অস্ট্রেলিয়ান টান শুনে বুঝতে পারলাম সে চায়নীজ হলেও হয় অস্ট্রেলিয়ায় জন্মেছে, নয় ছোটবেলা থেকেই আছে এদেশে। সাধারণত দুতিন বছরে এরকম একসেন্ট আয়ত্ত্ব করা সম্ভব নয়, বিশেষ করে কোন চায়নীজের পক্ষে। তাদের দেশের বেশির ভাগ স্কুলে ইংরেজী পড়ানোই হয়না।

বাসে প্রায় সবাই ঘুমাচ্ছে এখন। অনেকে রাবারের বালিশ সাথে এনেছে। এক অদ্ভুত ধরণের বালিশ এগুলো। গলার তিন পাশে আটকে থাকে। বাসের জন্যই উপযুক্ত এই বালিশ, বসে বসে ঘুমানোর জন্য। আমার বালিশ ছাড়া খুব একটা সমস্যা হয়না। জেনির চোখ বন্ধ। তারও কোন বালিশের ব্যবস্থা নেই। আমি সিটবেল্ট বেঁধে নিলাম। তাতে ঘুমের মধ্যে জেনির দিকে ঝুঁকে পড়ার ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাবো। ঘুম আসতে দেরী হলো না।

ঘুম ভাঙতেও দেরী হলোনা। বুকের ডান পাশে প্রচন্ড এক গুঁতো খেয়ে জেগে উঠেছি। বুঝতে পারছিনা গুঁতোটা এলো কোন দিক থেকে। জেনি অকাতরে ঘুমাচ্ছে। বাসের ভেতর কোন আলো জ্বলছে না। কেবল সিট নাম্বারগুলো জ্বলজ্বল করছে। সেই আলোতে দেখা গেলো ড্রাইভারের পাশে বসে একজন মহিলা ফিস ফিস করে কথা বলছেন। গাড়ি ঘন্টায় কমপক্ষে একশ কিলোমিটার বেগে ছুটছে। এই ওয়েস্টার্ন হাইওয়েতে স্পিডলিমিট ১১০ কিলোমিটার। রাত মাত্র সাড়ে এগারোটা। তার মানে মেলবোর্ন থেকে মাত্র একশ কিলোমিটারের মতো এসেছি।

বুকের ডান পাশটা বাম হাত দিয়ে ঘষছি- এমন সময় জেনির মাথাটা সজোরে আমার বুকে আছড়ে পড়লো। বুঝতে পারলাম গুঁতোর উৎস কোথায়। জেনির চুল ছোট করে ছাটা। মিষ্টি একটা গন্ধ নাকে আসছে। হয়তো তার চুলের গন্ধ। কিন্তু গন্ধ যত মিষ্টিই হোক এই মাথাতো সরানো দরকার। আমারো তো ঘুমানো দরকার। আস্তে করে জেনির মাথাটা ঠেলে দিতেই তা সোজা হয়ে গেলো। এখন দেখলে মনে হবে জেনি জেগে আছে। আমি নিজেকে যথা সম্ভব বাম দিকে সরিয়ে নিয়ে জানালায় মাথা রেখে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঘুম এলো না।

গাড়ি বালারাত পার হচ্ছে। বালারাত মেলবোর্ন থেকে ১১০ কিলোমিটার দূরের ছোট্ট উপশহর। রাতের আলোয় মনে হচ্ছে বাড়িগুলো সব সোনা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। সোনার মতো জ্বলজ্বল করছে সব। দেড়শো বছর আগের সেই সোনার খনি পাবার সময়টা ধরে রাখা আছে সযত্নে। ১৮৫১ সালে বালারাতে সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য সব জায়গার মতো এখানেও অধিকার আদায়ের জন্য শ্রমিকদের রক্ত দিতে হয়েছে। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে এখানে পুলিশের গুলিতে তিরিশ জন খনি শ্রমিক নিহত হয়েছে।

জেনির মাথাটা আবার আমার বুকের ডান পাশে এসে পড়েছে। একটু আস্তে এলে তবুও হতো। এসে পড়ে যেন পেনাল্‌টি কিকের বলের মতো। তার গলায় কি কোন হাড় নেই? এর একটা বিহিত করা দরকার। ডেকে সিটবেল্‌টা বাঁধতে বললেই হয়। তাতে আমি অন্তঃত রক্ষা পাই এই আক্রমণ থেকে। ফিস ফিস করে ডাকলাম,

- হাই জেনি-

কোন সাড়া নেই। তার কান আমার মুখের কাছে চলে এসেছে। ছোট্ট হলুদ কান। কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকলাম,

- জেনি -
- উঁ।
- ফেসেন্‌ ইওর সিট বেল্‌ট, প্লিজ।
- উঁ।

এবার দিলাম এক ঝাঁকুনি-

- ফ্যাসেন ইওর সিট বেল্‌ট।
- উঁম্‌ম্‌ - ক্যান ইউ ফিক্স ইট ফর মি প্লিজ - -

বলেই আবার ঘুমাচ্ছে। এতো দেখি আমার দিদির চেয়ে ঘুমকাতুরে। দেশের বাড়িতে দিদিকে

মশারী টাঙানোর জন্য ডাকলে অনেকবার এঁ উঁ করে শেষে বলতো, ‘একটু টাঙিয়ে দেনা, প্লিজ-।’ জেনির সিটবেলটটা বেঁধে দেয়া আমার নিজের স্বার্থেই জরুরি। ঘুমন্ত একজন মানুষের সিটবেল্ট একটু কষ্ট করেই বাঁধতে হলো। এবার নিশ্চিন্ত মনে ঘুমালাম।

ভোররাতে গাড়ির যাত্রাবিরতিতে ঘুম ভাঙলো। দেখলাম জেনির মাথাটা আমার দিকে কাৎ হয়ে ঝুলে আছে। সিটবেল্ট বাঁধা থাকাতে গড়িয়ে পড়তে পারেনি। মেয়েটার জন্য একধরনের মায়া হলো। কত বয়স হবে জেনির? সতেরো আঠারো। আমার ভাগনী মোমের বয়সী। এখনো কত সরল। পৃথিবীর কদর্য দিকটা জেনিকে দেখতে হয়নি এখনো। আমি কামনা করি কখনোই যেন তাকে দেখতে না হয়। কিন্তু শুধু শুভকামনায় যদি কাজ হতো পৃথিবীর তো এ অবস্থা হতো না।

যখন এডেলেইড পৌঁছলাম আমার ঘড়িতে বাজে সাড়ে সাতটা। মেলবোর্ন টাইম। সূর্য এখনো সোনালী। পাহাড়ী রাস্তার ওপর থেকে নিচের এডেলেইডকে কুয়াশা ঘেরা ছোট্ট একটা দ্বীপের মতো লাগছে। ড্রাইভার তার যাত্রা সমাপনী ভাষণ শুরু করলেন।